উপসংহার

প্রায়ই জনসাধারণ টীকার মধ্যে নতুন তত্ত্ব খোঁজেন; কিন্তু সত্য সবসময় সত্য হয়, নূতন বা পুরানো হয় না। নতুন সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়। সত্য অপরিবর্তনশীল তাহলে তা নতুন করে আর কেউ কি বলবে? যদি বলে, তবে বুঝতে হবে সে সত্যের সন্ধান পায়নি। প্রত্যেক মহাপুরুষ সেই পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর সেই একমাত্র সত্যই বলবেন। তাঁরা সমাজে বিভেদের সৃষ্টি করেন না, যদি কেউ করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি সত্যে পৌঁছাননি। শ্রীকৃষ্ণও সেই সত্য সম্বন্ধেই বলেছেন, যা পূর্বে মনীষীগণ দর্শন করেছিলেন, লাভ করেছিলেন ও ভবিষ্যতেও যদি কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তিনিও সেই একই কথা বলবেন।

মহাপুরুষ ও তাঁর কার্যপ্রণালী—মহাপুরুষ সর্বদা সমাজে প্রচলিত সত্যের নামে যে কুরীতি-কুপ্রথা থাকে, তা খণ্ডন করে কল্যাণের পথটি প্রশস্ত করেন। সেই কল্যাণের পথ পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরও মত ও পথ প্রচলিত হয়, যা সত্য বলে মনে হয়। এই সকল মত ও পথের মধ্যে যথার্থ মত কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়। মহাপুরুষ সত্যে স্থিত সেইজন্য সত্যটি চিনে, ভ্রান্ত জনসাধারণকে সত্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা প্রদান করেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, কবীর, গুরু নানক প্রভৃতি প্রত্যেক মহাপুরুষ এই প্রয়াস করেছেন। মহাপুরুষের তিরোধানের পর অনুগামীগণ তাঁর নির্দেশিত পথে না চলে তাঁর জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান ও যেখানে যেখানে তিনি বিচরণ করেছেন, সেই স্থানগুলির পূজা করা শুরু করেন। ক্রমশঃ তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করা শুরু করেন। যদিও আরম্ভে ভক্তেরা তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে এইরূপ করেন; কিন্তু কালান্তরে সমাজ ভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও শেষে ভ্রম গোঁড়ামীর রূপ নিয়ে নেয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও তৎকালীন সমাজে সত্যের নামে প্রচলিত রীতি-নীতির খণ্ডন করে সমাজকে কল্যাণের প্রশস্ত পথ দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে তিনি বলেছেন, অর্জুন! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই ও সত্যের তিনকালে অভাব নেই। আমি ভগবান সেইজন্য বলছি না, বরং এর ভেদ তত্ত্বদর্শীগণ অনুভব করেছেন;

ও সেই সত্য সম্বন্ধেই আমি বলছি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা সেইভাবেই করেছেন, যা '**ঋষিভির্বহুধাগীতম্**'- ঋষিগণ দ্বারাও প্রায়ই গায়ন করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগ ও সন্ন্যাস তত্ত্ব বুঝিয়ে তিনি তৎকালীন প্রচলিত চারটি মতের মধ্যে থেকে একটি চয়ন করে সেটিতেই নিজের সমর্থন দিলেন।

সন্ন্যাস—কৃষ্ণকালে অগ্নিত্যাগী ও ঈশ্বর চিন্তনের ত্যাগীগণ নিজেদের যোগী, সন্ন্যাসী বলে একটা কর্মত্যাগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল। এর খণ্ডন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ, উভয়মার্গের মধ্যে একটির অনুসারেও কর্মত্যাগ করার বিধান নেই।" উভয়মার্গেই কর্ম করতেই হবে। কর্ম করতে করতে একসময় সাধনা এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে সঙ্কল্পের অভাব হয়ে যায়, এই স্থিতিকেই পূর্ণ সন্ন্যাস বলে এর আগে কাউকে সন্ন্যাসী নাম দেওয়া যেতে পারে না। কেবল ক্রিয়াত্যাগ করলে ও অগ্নিস্পর্শ না করলে কেউ সন্ন্যাসী হয় না বা যোগী হয় না। (এই বিষয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও বিশেষ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।)

কর্ম—এইরূপ ভ্রান্তি কর্মের প্রতিও ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২/৩৯শ শ্লোকে যোগেশ্বর বলেছেন যে, অর্জুন! এহে বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে হয়েছে, এখন একেই তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম-বন্ধনের নাশ উত্তমরূপে করতে পারবে। এই কর্মের অল্প আচরণও জন্ম-মৃত্যুর মহাভীতি থেকে উদ্ধার করে। এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া একটাই, বুদ্ধি ও দিক্‌ও একটাই; কিন্তু অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয়, সেইজন্য তারা কর্মের নামে অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। অর্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম কর। অর্থাৎ ক্রিয়া তো অনেক আছে কিন্তু সে সমস্ত কর্ম নয়। কর্ম হল একটা নির্ধারিত দিক্। কর্ম জন্ম-জন্মান্তরের দেহযাত্রা সমাপ্ত করে। যদি এরপরে আর একটা মাত্রও জন্ম নিতে হয়, তাহলে যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে কোথায়?

যজ্ঞ—এই নিয়ত কর্মটি কি? শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করেছেন যে, '**যজ্ঞার্থাৎকর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।**'-অর্জুন! যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এই কর্ম ভিন্ন জগতে যা কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, তা ইহলোকেরই বন্ধন, সেগুলি কর্ম নয়। কর্ম তো এই সংসার-বন্ধন থেকে মোক্ষ প্রদান করে। এখন প্রশ্ন যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্ম সম্পাদন হবে? চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের তেরো-চৌদ্দটি পদ্ধতির সম্বন্ধে

বলেছেন যা হল পরমাত্মায় প্রবেশের বিধি-বিশেষ-এর বর্ণনা, এ সমস্তই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান, চিন্তন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এও স্পষ্ট করলেন যে, ভৌতিক (সাংসারিক) দ্রব্যগুলির সঙ্গ এই যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নেই। ভৌতিক দ্রব্যগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা অত্যল্প। আপনি কোটি টাকার হোম করুন না কেন। সম্পূর্ণ যজ্ঞ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তঃক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়ে। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর যজ্ঞ থেকে যে অমৃত-তত্ত্ব লাভ হয়, সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে জানাকেই জ্ঞান বলে। যে যোগী সেই জ্ঞানামৃত পান করনে, তিনি সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ পান। যিনি সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ করেছেন, সেই পুরুষের কর্ম করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইজন্য যাবন্মাত্র কর্ম সেই সাক্ষাৎকারসহিত জ্ঞানে সমাহিত হয়ে যায়। তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইরূপ নির্ধারিত যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া কর্ম। কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল—আরাধনা।

এই নিয়ত কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম অথবা তদর্থ কর্মের অতিরিক্ত গীতাশাস্ত্রে অন্য কোন কর্ম নেই। এর উপর শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্থানে জোর দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এটিকেই তিনি 'কার্যম্ কর্ম' বলেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে বলেছেন যে কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করলেই সেই কর্ম আরম্ভ হয়, যা পরমশ্রেয় প্রদান করে। সাংসারিক কর্মগুলিতে যে যত ব্যস্ত, তার মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ সেই পরিমাণেই থাকে, সমৃদ্ধ দেখা গেছে। এই নিয়ত কর্মকে তিনি শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্মের নাম দিয়েছেন। গীতা স্বয়ং পূর্ণ শাস্ত্র। সর্বোপরি শাস্ত্র বেদ, বেদের সার উপনিষদ্ এবং সেগুলির সারাংশ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী গীতাশাস্ত্র। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়েও শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্ম, নিয়ত, কর্ম, কর্তব্য কর্ম ও পুণ্যকর্মদ্বারা ইঙ্গিত করে তিনি বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিয়ত কর্মই পরমকল্যাণকর।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা সেই নিয়ত কর্ম না করে, শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুসারে না চলে কপোলকল্পিত অনুমান করেন যে, যা কিছু কার্য করা হয় এই সংসারে, সেগুলিই কর্ম। কিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই কেবল কর্মফলের কামনা ত্যাগ কর, তবেই হবে নিষ্কাম কর্মযোগ। কর্তব্য ভেবে করে গেলেই কর্তব্যযোগ হবে। সমস্ত ক্রিয়া নারায়ণকে সমর্পণ করে করলেই সমর্পণ যোগ হবে। এইরূপ যজ্ঞের নামে আমরা ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, বিষ্ণুর নিমিত্তে যজ্ঞ কল্পনা করি এবং সেই ক্রিয়াতে স্বাহা বলে উঠে পড়ি। যদি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

স্পষ্ট করে না বলতেন, তাহলে আমরা যা খুশি করতাম ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যখন বলেছেন, ও যতটা বলেছেন, ততটাই মেনে চলুন। কিন্তু আমরা সেই অনুসারে চলতে পারি না। বংশ-পরম্পরায় বহু রীতি-নীতি, পূজা-পদ্ধতি আমরা মেনে চলে আসছি যেগুলি আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। সাংসারিক বস্তু আমরা ত্যাগ করতে চাইলে হয়ত করতেও পারি; কিন্তু এই পূর্বসংস্কার আমরা মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের বাণীও আমরা সেই অনুসারেই গ্রহণ করি। গীতা অত্যন্ত সহজ বোধগম্য, সরল সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্র, যদি আপনি শুধু এতে নিহিত যথার্থকেই গ্রহণ করেন, তবুও আর কখনও মনে সংশয় জাগবে না। এই প্রয়াসই প্রস্তুত পুস্তকে করা হয়েছে।

যুদ্ধ—যদি যজ্ঞ ও কর্ম এই দুটি প্রশ্নই যথার্থ বোধগম্য হয়, তাহলে যুদ্ধ, বর্ণ-ব্যবস্থা, বর্ণ সঙ্কর, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ অথবা সংক্ষেপে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রই আপনাদের সহজবোধ্য হবে। অর্জুন যুদ্ধে ইচ্ছুক ছিলেন না, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পশ্চাৎভাগে গিয়ে বসেছিলেন; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কর্মের শিক্ষা দিয়ে কেবল কর্ম করার পথই দেখালেন না বরং অর্জুনকে সেই কর্মপথে চালিতও করেছিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গীতাশাস্ত্রে ১৫-২০টা শ্লোক এমন আছে যেগুলিতে বার বার বলা হয়েছে যে, অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। কিন্তু একটা শ্লোকও এমন নেই, যা বাহ্য যুদ্ধের সমর্থন করে। (দ্রষ্টব্য-অধ্যায় ২, ৩, ১১, ১৫ এবং ১৮) কারণ যে কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—তা ছিল নিয়ত কর্ম, যা নির্জনে বাস, চিত্তকে সংযত করে ধ্যান করলেই হয়। যদি কর্মের স্বরূপ এটাই, নির্জনে চিত্ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকবে, তাহলে যুদ্ধ কিরূপে হবে? গীতোক্ত কল্যাণ যদি কেবল যোদ্ধাদের জন্যই, তাহলে গীতা থেকে আপনার লাভ কি হবে? আপনার সমক্ষে অর্জুনের মত কোন যুদ্ধের পরিস্থিতিও তো নেই। বস্তুতঃ তখনও যে পরিস্থিতি ছিল আজও তেমনি আছে। যখন চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে একাগ্র করে আপনি হৃদয়-দেশ-এ ধ্যান করা শুরু করবেন, তখন কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি বিকার আপনার চিত্তকে স্থির হতে দেবে না। সেই বিকারগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ, তাদের নিশ্চিহ্ন করাই যুদ্ধ। বিশ্বে কোথাও না কোথাও যুদ্ধ লেগেই আছে; কিন্তু তা থেকে কল্যাণ নয় বরং বিনাশই হয়। এর পরিণাম শান্তি বলুন অথবা পরিস্থিতি। অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভ হয় না। শান্তি তখনই লাভ হয়, যখন এই আত্মা নিজের

শাশ্বত স্থিতিলাভ করে। এটাই একমাত্র শান্তি যার পশ্চাতে অশান্তি নেই। কিন্তু এই শান্তি সাধনগম্য, এর জন্য নিয়ত কর্মের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্ণ—এই কর্মকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সাধক চিন্তন-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে-এর গতি রুদ্ধ করতে সমর্থ হন; তো কেউ বা দুই ঘন্টা চিন্তনে বসেও দশ মিনিটের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারেন না। এইরূপ স্থিতিযুক্ত অল্পজ্ঞ সাধক শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর সাধকগণ নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা পরিচর্যা থেকেই কর্ম আরম্ভ করবেন। ক্রমোন্নতি দ্বারা এই শূদ্র শ্রেণীর সাধকই বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও বিপ্র শ্রেণীর যোগ্যতালাভ করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণীও দোষযুক্ত; কারণ এই শ্রেণীতে সাধক ও ব্রহ্ম ভিন্নভিন্নই থাকেন। ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হলে সাধক তার পর ব্রাহ্মণও থাকেন না।

বর্ণের অর্থ আকৃতি। এই দেহটা আপনার আকৃতি নয়। যেমন আপনার বৃত্তি, আপনার আকৃতিও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—অর্জুন! পুরুষ শ্রদ্ধাবান্ হয়, তার শ্রদ্ধা কোথাও না কোথাও অবশ্যই স্থির থাকে। যেরূপ শ্রদ্ধা সেই পুরুষের সেইরূপ সে নিজেও হয়। যেমন বৃত্তি, তেমনি হয় পুরুষ। বর্ণ কর্মের ক্ষমতার আন্তরিক মানদণ্ড; কিন্তু লোকে নিয়ত কর্মত্যাগ করে বাহ্য সমাজে জন্মের আধারের উপর জাতিকে বর্ণ বলে তাদের জীবিকা নির্ধারিত করে দিয়েছে, যা শুধু একটা সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। তারা কর্মের যথার্থরূপকে বিকৃত করে, যাতে তাদের সারহীন সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার উপর কোন প্রভাব না পড়ে। কালান্তরে বর্ণের নির্ধারণ কেবল জন্ম থেকে হতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু এরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। ভারতবর্ষের বাইরে কি এই সৃষ্টি নেই? অন্যত্র কোথাও এইরূপ জাতি-ব্যবস্থা নেই। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত সহস্র জাতি-উপজাতি বিদ্যমান। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ মানুষের বিভাগ চার শ্রেণীতে করেছেন? না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'—গুণের আধারে কর্মের বিভাগ করেছেন। '**কর্মাণি প্রবিভক্তানি**'—কর্মকে ভাগ করা হয়েছে। কর্ম কি তা বুঝতে পারলে বর্ণও স্পষ্ট হবে এবং বর্ণ বুঝলে বর্ণসঙ্করের যথার্থরূপ আপনি অবগত হবেন।

বর্ণসঙ্কর—এই কর্মপথ থেকে বিচ্যুত হওয়াই বর্ণসঙ্কর। আত্মার শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মা। যে কর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে সেই কর্ম থেকে বিচলিত হয়ে প্রকৃতিতে জড়িয়ে যাওয়াই বর্ণসঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে, এই কর্মের অনুষ্ঠান

না করে কেউই সেই স্বরূপলাভ করতে পারে না এবং প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষকে কর্ম করলে না কোন লাভ হয় এবং ত্যাগ করলে না কোন লোকসান হয়। তাসত্ত্বেও লোক-সংগ্রহের জন্য তাঁরা কর্ম করেন। সেই মহাপুরুষদের মত আমারও প্রাপ্তযোগ্য কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নেই; কিন্তু তবুও আমি অনুগামীদের হিতার্থে কর্মে প্রবৃত্ত থাকি। যদি কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি তবে সকলেই বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে। স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় একথা শোনা যায়; কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ কর্ম না করলে অনুগামীগণ বর্ণসঙ্কর হবে। সেই মহাপুরুষকে কর্ম না করতে দেখে তারাও কর্মত্যাগ করে প্রকৃতিতে ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে; কারণ এই কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতি, নিজের শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মাকে লাভ করা যেতে পারে।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ– কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম, আরাধনা; কিন্তু এই কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টিকোণ দুটি। নিজের সামর্থ্য অনুসারে, লাভ-লোকসানের নির্ণয় করে এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া 'জ্ঞানযোগ'। এই মার্গের সাধক জানেন যে, "আজ আমার এই স্থিতি, এর পর এই ভূমিকায় পৌঁছাব। তার পর স্বরূপলাভ করব।" এইরূপ ভাব নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হন। নিজ স্থিতি অবগত হয়ে চলেন, সেইজন্য এদের জ্ঞানমার্গী বলা হয়। সমর্পণের সঙ্গে সেই একই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, লাভ-লোকসানের দায়িত্ব ইষ্টের হাতে তুলে চলা নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিমার্গ। উভয়মার্গেরই প্রেরক সদ্‌গুরু। একই মহাপুরুষের নিকট শিক্ষা নিয়ে একজন স্বাবলম্বী হয়ে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং অন্যজন তাঁর নিকট শিক্ষা নিয়ে, তাঁর উপর নির্ভর করে প্রবৃত্ত হন। পার্থক্য কেবল এইটুকুই। সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–অর্জুন! সাংখ্যযোগদ্বারা যে পরমসত্য লাভ হয়, সেই পরমসত্য নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারাও লাভ হয়। যিনি দুটিকেই এক দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। দুটি ক্রিয়ার বক্তা তত্ত্বদর্শী একজনই, ক্রিয়াও একটা-আরাধনা। উভয়মার্গীই কামনাগুলিকে ত্যাগ করেন এবং পরিণামও একটাই। কেবল কর্ম-এর করার দৃষ্টিকোণ দুটি।

একমাত্র পরমাত্মা–নিয়ত কর্ম হচ্ছে, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একটা নির্ধারিত অন্তঃক্রিয়া। যখন এটাই কর্মের স্বরূপ, তখন মন্দির, মসজিদ; চার্চ নির্মাণ করে দেবী-দেবতার মূর্তি অথবা প্রতীক পূজা কতটা সঙ্গত? ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ (বস্তুতঃ এরা সনাতনধর্মী। তাদের পূর্বপুরুষগণ পরমসত্যের দিগ্‌দর্শন করে দেশে-বিদেশ-এ

তা প্রচার করেছেন। সেই পথের পথিক, বিশ্বে যেখানেই থাক, সে সনাতনধর্মী। এত গৌরবশালী হিন্দুসমাজ) কামনাদ্বারা অভিভূত হয়ে বিবিধ ভ্রান্তিতে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন! দেবস্থানে দেবতা বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। যেখানেই মানুষের শ্রদ্ধা স্থির হয়, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমিই ফলপ্রদান করি, তার শ্রদ্ধা পুষ্ট করি; কারণ সর্বত্র আমি। কিন্তু তার সেই পূজা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্য ফল নষ্ট হয়ে যায়। কামনাদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, সেই মূঢ়গণই অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ-রাক্ষসগণের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেত-এর পূজা করে। কঠিন তপস্যা করে; কিন্তু অর্জুন! তারা দেহস্থিত ভূতসমুদায় এবং অন্তঃকরণে স্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে কৃশ করে, পূজা করে না। তাদের তুমি নিশ্চয় আসুরিক স্বভাবযুক্ত জানবে। এর থেকে বেশী শ্রীকৃষ্ণ কি বলতেন? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—অর্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন, কেবল তাঁর শরণে যাও। পূজাস্থলী হৃদয়, বহির্জগৎ নয়। তা সত্ত্বেও লোকে প্রস্তর-জল, মন্দির-মসজিদ, দেবী-দেবতার পূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিরও পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে চলার জন্য জোর দিতেন এবং যারা সারাজীবন মূর্তি-পূজার খণ্ডন করেছেন সেই বুদ্ধের অনুযায়ীগণও যথাক্রমে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরী করে পূজা করা আরম্ভ করেছেন। যদিও বুদ্ধদেব তাঁর নিকট শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন-আনন্দ! তথাগতের শরীর-পূজায় সময় নষ্ট করো না।

মন্দির, মসজিদ, চার্চ, তীর্থ, মূর্তি এবং স্মারকসমূহদ্বারা পূর্ববর্তী মহাপুরুষ-গণের স্মৃতিরক্ষা হয়ে থাকে, যাতে তাঁদের উপলব্ধির কথা স্মরণ হতে থাকে। মহাত্মা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই হয়েছেন। জনককন্যা 'সীতা' পূর্বজন্মে এক ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। পিতাদ্বারা প্রেরিত হয়ে পরমব্রহ্ম লাভের জন্য তিনি তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু সেই জন্মে সফল হতে পারেন নি। পরের জন্মে তিনি রামকে পেয়েছিলেন এবং চিন্ময়, অবিনাশী, আদিশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঠিক সেই প্রকার রাজকুলে উৎপন্ন মীরার মধ্যে পরমাত্মার প্রতি ভক্তির প্রস্ফুটন হয়েছিল। সবকিছু ত্যাগ করে তিনি ঈশ্বর-চিন্তনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পথের সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি সফল হয়েছিলেন। এঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, স্মারক তৈরী হয়েছে, যাতে সমাজ এঁদের স্মরণ করে এঁদের উচ্চাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত

হতে পারে। মীরা, সীতা অথবা এই পথের যত শোধকর্তা মহাপুরুষ আমাদের আদর্শ। আমাদের সর্বদা এঁদের পদচিহ্নের অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু এর চাইতে বড় ভুল কি হবে, যদি আমরা কেবল তাঁদের চরণে ফুল অর্পণ করে, চন্দন লাগিয়ে নিজেদের কর্তব্যের ইতি বলে মনে করি।

প্রায়ই এরূপ হয় যে, যিনি যাঁর আদর্শ হন, তাঁর মূর্তি, ছবি, খড়ম, তাঁর স্থান অথবা সম্বদ্ধ কোন বস্তু-দর্শনে, শ্রবণে মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এটা স্বাভাবিক। আমরাও আমাদের গুরুদেবের ছবির অপমান করতে পারি না; কারণ তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁরই প্রেরণা ও কথনানুসারে আমাদের চলতে হবে। তাঁর যে স্বরূপ, ক্রমশ: চলে সেই স্বরূপের প্রাপ্তি আমাদেরও অভীষ্ট এবং এটাই হল তাঁর যথার্থ পূজা। এতদূর পর্যন্ত তো ঠিক আছে যে, বস্তুতঃ যিনি আদর্শ, তাঁকে অনাদর করা উচিত নয়; কিন্তু শুধু পত্র-পুষ্প অর্পণ করাটাই ভক্তি মনে করে সেটাকেই কল্যাণের সাধন বলে মেনে নেওয়া, আমাদের লক্ষ্য থেকে বহুদূরে সরিয়ে দেবে।

নিজের আদর্শের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এবং সেই অনুসারে চলার প্রেরণা গ্রহণ করার জন্যই এই স্মারকগুলির উপযোগিতা আছে; তা সেই স্থানকে আশ্রম, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, মঠ, বিহার, গুরুদ্বারা যা-ই বলুন না কেন। শর্ত এই যে, সেই কেন্দ্রগুলির সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে থাকবে। যাঁর প্রতিকৃতি আছে, তিনি কি করেছেন ? কিরূপে তপস্যা করেছেন ? কিরূপে লাভ করেছেন ? কেবল এতটা জানার জন্যই তো আমরা সেখানে যাই এবং যাওয়াও উচিত; কিন্তু যদি এই স্থানগুলিতে মহাপুরুষের পদচিহ্ন অনুসরণের বিষয়ে বলা না হয়, করে শেখানো না হয়, কল্যাণের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেইসব স্থানের কোন উপযোগিতা নেই। সেখানে কুরীতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। সেখানে গেলে ক্ষতিই হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঘরে-ঘরে, অলিতে-গলিতে গিয়ে উপদেশ দেওয়া থেকে সামুহিক উপদেশ কেন্দ্ররূপে এই ধার্মিক সংস্থাগুলির স্থাপনা করা হয়েছিল; কিন্তু কালান্তরে এই প্রেরণাস্থলী সমূহই মূতি-পূজা ও গোঁড়ামীর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, ও এখান থেকেই যত ভ্রম উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

গ্রন্থ—সেইজন্য শাস্ত্রানুশীলন আবশ্যক, যাতে আপনি সেই নির্দিষ্ট ক্রিয়া বুঝতে পারেন, সেই নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত কর্ম বলেছেন এবং যখন বুঝতে পারবেন সেই নিয়ত কর্ম কি, তখন কর্মে প্রবৃত্ত হবেন। যখনই বিস্মৃত হবেন,

তখনই আবার অধ্যয়ন করে নিন। এমন করবেন না যে গ্রন্থটিকে প্রণাম করে অক্ষত, চন্দনাদি দ্রব্য দিয়ে পূজা করে তুলে রেখে দেবেন। গ্রন্থ পথ-নির্দেশক, যা সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই গ্রন্থের সাহায্যেই এগিয়ে যান নিজের গন্তব্যের দিকে। যখন হৃদয়ে ইষ্টকে ধারণ করতে সক্ষম হবেন, তখন সেই ইষ্টই গ্রন্থের স্থান গ্রহণ করবেন। অতএব স্মৃতিরক্ষা করা লোকসানের কিছু নয়; কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্নগুলির শুধু পূজা করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়াতে কোন লাভ হয় না।

ধর্ম–(অধ্যায় ২/১৬-২৯) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সত্যের কোনকালে অভাব নেই। পরমাত্মাই সত্য, শাশ্বত, অজর, অমর, এমন অপরিবর্তনশীল এবং সনাতন; কিন্তু সেই পরমাত্মা অচিন্ত্য এবং অগোচর, চিত্তের তরঙ্গের অতীত। চিত্ত নিরোধ কিরূপে সম্ভব? চিত্ত নিরুদ্ধ করে পরমাত্মাকে লাভ করার বিধি-বিশেষের নাম কর্ম। এই কর্মকে করে যাওয়াই ধর্ম ও দায়িত্ব।

গীতা (অধ্যায় ২/৪০)তে বলেছেন যে, অর্জুন! এই কর্মযোগে আরম্ভে নাশ নেই। এই কর্মরূপ ধর্মের অল্প সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে অর্থাৎ এই কর্মকে করে যাওয়াই ধর্ম।

এই নিয়ত কর্ম (সাধন-পথ) কে সাধকের স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কর্ম অবগত হয়ে মানুষ যখন থেকে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তখন সেই আরম্ভিক অবস্থাতে সে শূদ্র। ক্রমশঃ যখন বিধি আয়ত্তে আসে, তখন সেই বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির সংঘর্ষকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং শৌর্যযুক্ত হলে সেই ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মের তদ্রূপ হওয়ার ক্ষমতা, জ্ঞান (বাস্তবিক জানা) , বিজ্ঞান (ঈশ্বরীয় বাণী শোনা) সেই অস্তিত্বের উপর নির্ভর থাকার ক্ষমতা-এরূপ যোগ্যতা লাভ হলে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (গীতা, অধ্যায় ১৮/৪৬-৪৭) বলেছেন যে, স্বভাবে যে ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া স্বধর্ম। গুরুত্ব কম হলেও স্বভাবে উপলব্ধ স্বধর্ম শ্রেয়স্কর ও ক্ষমতালাভ না করে অন্যের উন্নত কর্মের অনুকরণ ক্ষতিকর। স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর; কারণ বস্ত্র পরিবর্তন করলে পরিবর্তন কর্তার তো পরিবর্তন হয় না। তার সাধনার ক্রম আবার সেখান থেকেই আরম্ভ হবে, যেখানে ছেদ পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে চলে তিনি পরমসিদ্ধি অবিনাশী পদলাভ করেন।

এরই উপর জোর দিয়ে বলছেন যে, যে পরমাত্মা থেকে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, যিনি সর্বব্যাপ্ত, স্বভাবে যে ক্ষমতা বিদ্যমান সেই ক্ষমতানুসারে তাঁকে উত্তমরূপে পূজা করে মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ নিশ্চিত বিধিদ্বারা এক পরমাত্মার চিন্তনই ধর্ম।

ধর্মে প্রবেশ কাদের? ধর্মের আচরণ করার অধিকার কাদের?- এ বিষয়ে যোগেশ্বর স্পষ্ট বলেছেন যে, "অর্জুন! অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে (অনন্য অর্থাৎ অন্য নয়), আমা ভিন্ন অন্য কারও ভজনা করে না, কেবল আমাকে ভজনা করে, **'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'**—সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়, তার আত্মা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।" অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে—ধর্মাত্মা সেই, যে এক পরমাত্মাতে অনন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত। ধর্মাত্মা সেই, যে একমাত্র পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য নিয়ত কর্মের আচরণ করে। ধর্মাত্মা সেই, যে স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে পরমাত্মার খোঁজে রত।

অবশেষে বলছেন যে— "**সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**"—অর্জুন! সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। অতএব একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত ব্যক্তিই ধার্মিক। একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করাটাই ধর্ম। সেই এক পরমাত্মার প্রাপ্তির নিশ্চিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা ধর্ম। এইরূপ স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্তই সৃষ্টিতে একমাত্র ধর্ম। তাঁদের শরণাগত হওয়া উচিত তাঁরা কিরূপে সেই পরমাত্মাকে লাভ করেছেন? কোন পথে গমন করেছেন? সেই মার্গ একটাই, সেই মার্গে চলা ধর্ম।

ধর্ম আচরণের বিষয়। সেই আচরণ কেবল একটাই—"**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।**" (২/৪১) এই কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা ক্রিয়া একটাই—ইন্দ্রিয়সমূহের চেষ্টা এবং মনের কার্যকে সংযম করে আত্মাতে (পরাৎপর ব্রহ্মে) প্রবাহিত করা (৪/২৭)।

ধর্ম-পরিবর্তন— সনাতন ধর্মের আদিদেশ ভারতবর্ষে একসময় কুপ্রথা-কুরীতি এতবেশী প্রচলিত ছিল যে, মুসলমানদের আক্রমণের সময় তাদের ধর্ম আক্রমণকারীদের হাতের এক গ্রাস ভাত খাওয়াতে, দুঢোক জল পান করাতেই নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ধর্মভ্রষ্ট ঘোষিত হাজার হাজার হিন্দু আত্মহত্যা করে নিয়েছিল।

ধর্মের জন্য তারা আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ধর্ম বুঝে করলে তবে তো। ধর্ম লজ্জাবতী লতার মত হয়ে গিয়েছিল। লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁলেই তার পাতা সঙ্কুচিত হয়ে যায়, হাত সরালেই আবার বিকশিত হয়; কিন্তু তাদের সনাতন ধর্ম তো এমন লোপ পেল যে তার আর বিকাশ হলই না। যে সনাতন আত্মাকে ভৌতিক বস্তুগুলি স্পর্শও করতে পারে না, তা কি কখনও ছোঁয়া-খাওয়াতে নষ্ট হয়? আপনার মৃত্যু তো তরবারির আঘাতে হবে আর ধর্মের ছোঁয়াতেই মৃত্যু হবে? সতি কি ধর্ম নষ্ট হয়েছিল? কখনও না, ধর্মের নামে যে কুরীতি প্রচলিত ছিল, তা নষ্ট হয়েছিল। ফিরোজ তুগলকের শাসনকালে বয়ানার কাজী মুগীসুদ্দীন ব্যবস্থা দিয়েছিল যে, হিন্দুদের মুখ খুলে চলা উচিত, কারণ যদি কোন মুসলমান থুতু ফেলতে চায়, তাহলে সেই হিন্দু ধর্মাত্মা হয়ে যাবে কারণ তার কোন ধর্ম নেই। কি খারাপ বলেছিল সে? মুখে থুতু ফেললে তো একজনই মুসলমান হবে, কুয়োতে থুতু ফেললে তো হাজার হাজার লোক মুসলমান হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সেই কাজী আততায়ী ছিল অথবা সেই সময়ের হিন্দু সমাজ?

সেই যুগে যারা এইভাবে ধর্ম-পরিবর্তন করে নিয়েছিল, তারা কি সত্যি কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল? হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া অথবা এক প্রকারের আচার-ব্যবহার থেকে অন্য প্রকারের সমাজ ব্যবস্থায় চলে যাওয়াটা ধর্ম নয়। এই প্রকার পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে যারা তাদের ধর্মান্তরণ করেছিল, তারা কি ধর্মাত্মা ছিল? তারা তো আরও বেশী কুরীতির শিকার ছিল। হিন্দুরা আরও বেশী কুপ্রথায় জড়িয়ে পড়েছিল। অবিকসিত ও পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে সভ্য করার জন্য মহম্মদ বিবাহ, তালাক, উইলের কাগজ দেনা-পাওনা, সুদ, সাক্ষী, প্রতিজ্ঞা, প্রায়শ্চিত্ত, অন্নসংস্থান, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে এক সামাজিক ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এবং মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, চুরি, মদ, জুয়া, মা-ঠাকুরমার সঙ্গে বিবাহে করতে নিষেধ করে ছিলেন। সমলৈঙ্গিক এবং রজস্বলা স্ত্রীর সঙ্গে মৈথুন নিষেধ করে, রোজার দিনগুলিতেও এই নিয়ম শিথিল করেছিলেন। স্বর্গে বহু সমবয়স্ক, অপূর্ব সুন্দরী ও কিশোর বালকদের প্রলোভন দিয়েছিলেন। এটা ধর্ম ছিল না, এক প্রকারের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কিছু কিছু বলে তিনি বাসনায় নিমজ্জিত সমাজকে সেদিক থেকে বিমুখ করে নিজের দিকে উন্মুখ করার চেষ্টা করেছিলেন। স্ত্রীজাতিকে নিয়ে কোন চিন্তাই করেননি যে, তারা স্বর্গে গিয়ে কতগুলো পুরুষলাভ

করবে? এদোষ তাঁর নয়, দোষ সেই দেশকাল ও পরিস্থিতির, যখন স্ত্রী জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ধ্যান দেওয়া হত না।

মহম্মদ সাহেব যেটাকে ধর্ম বলেছেন, সেদিকে কারও ধ্যানই নেই। তিনি বলেছিলেন যে, যে পুরুষের একটা শ্বাসও সেই খোদার নাম ছাড়া ব্যর্থ যায়, তাকে খোদা সেইভাবেই প্রশ্ন করে, যেভাবে কোন পাপীকে তার পাপের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার শাস্তি হল সর্বদার জন্য (দোজখ) নরকে বাস। কয়জন সত্যিকার মুসলমান, কোটি-কোটি ব্যক্তির মধ্যে দু'একজনই এমন রয়েছেন, যাঁরা শ্বাস-এ নিরন্তর খোদার নাম জপ করে চলেছেন। বাকী সকলের শ্বাস ব্যর্থই যায়। পাপীদের জন্য যে শাস্তির বিধান এদের ক্ষেত্রেও সেটাই, তা'হল নরক (দোজখ)। মহম্মদ বলেছিলেন যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না, পশুদের আঘাত করে না সে আকাশ থেকে খোদার যে আওয়াজ আসে, তা শুনতে পায়। এটা প্রত্যেক স্থানের জন্য প্রযোজ্য ছিল; কিন্তু অনুগামীগণ এটাকে অন্যভাবে বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে, মক্কাতে একটা মসজিদ আছে, সেখানে সবুজ ঘাস তোলা উচিত নয়, সেই মসজিদে কোন পশুকে হত্যা করা উচিত নয়, সেস্থানে কাউকে আঘাত করা উচিত নয় এবং যে অবস্থাতে আগে ছিল, আবার সেই অবস্থাতেই গিয়ে পৌঁছেছিল। মহম্মদ খোদার আওয়াজ শোনার আগে কি কোন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন? কখনও কোন মসজিদে কি কোরানের বাক্যও শুনেছে কেউ। এই মসজিদ তো সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। মহম্মদ সাহেবের আশয় তবরেজ বুঝেছিলেন, মনসুর বুঝেছিলেন, ইকবাল বুঝেছিলেন; কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের যাতনা দেওয়া হয়েছিল। সুকরাতকে বিষ দেওয়া হয়েছিল; কারণ তিনি লোকেদের নাস্তিক করে দিচ্ছিলেন, যীশুর উপরও এইরূপ দোষারোপ করা হয়েছিল, তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছিল; কারণ তিনি বিশ্রাম সব্বাথের দিনেও কাজ করতেন, অন্ধদের চক্ষুদান করতেন। এই ভারতেও হয়। যখনই কোন প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেন, তখনই এই মন্দির, মসজিদ, মঠ, সম্প্রদায় ও তীর্থস্থানের ভরসায় যাদের জীবিকা চলে, তারা হায় হায় করতে শুরু করে, অধর্ম অধর্ম বলে চিৎকার আরম্ভ করে দেয়। কারও-কারও এগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার আয় হয়, আবার কারও ডাল-রুটির ব্যবস্থা কোন রকমে হয়ে যায়। বাস্তবিকতার প্রচারে তাদের জীবিকা সংকটে পড়তে পারে ভেবে তারা সত্যটিকে প্রকাশ হতে দেয় না

আর দেবেও না। এছাড়া তাদের বিরোধিতার আর কোন কারণ নেই। সুদূরকালে এইসব স্মৃতি কেন রক্ষা করা হয়েছিল, সেসব কারণ তাদের জানা নেই।

গৃহস্থের অধিকার—প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা করে যে যদি কর্মের স্বরূপ এটাই, যাতে নির্জনে বাস, ইন্দ্রিয়সংযম, নিরন্তর চিন্তন ও ধ্যান আবশ্যক, তবে তো গীতাশাস্ত্র গৃহস্থদের জন্য নয়, অনুপযোগী। তবে তো গীতাশাস্ত্র কেবল সাধুদের জন্যই। কিন্তু তা নয়। গীতাশাস্ত্র মূলতঃ তাদের জন্য, যারা এই পথের পথিক ও অংশতঃ তাদের জন্যও, যে এই পথের পথিক হতে ইচ্ছুক। গীতাশাস্ত্রের আশয় মানুষমাত্রের জন্য সমান। সদ্‌গৃহস্থের জন্য তো এর উপযোগিতা বিশেষ; কারণ কর্ম গৃহস্থাশ্রম থেকেই আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের নাশ নেই। এর অল্পসাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। আপনিই বলুন, অল্প সাধন কে করবে, গৃহস্থ অথবা বৈরাগী? গৃহস্থই এরজন্য অল্পসময় দেবে, এটা তার জন্যই। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে তিনি বলেছেন—অর্জুন! যদি তুমি সকল পাপী থেকে অধিক পাপিষ্ঠ হও, তবুও জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে। অধিক পাপী কে? যে অনবরত নিযুক্ত সে অথবা যে এখন নিযুক্ত হবে সে? অতএব সদ্‌গৃহস্থ আশ্রম থেকেই কর্ম আরম্ভ হয়। সষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৩৭ থেকে ৪৫ এর মধ্যে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! শিথিল প্রযত্নশীল শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ পরমগতি লাভ না করে কোন গতি প্রাপ্ত হন? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! যোগ থেকে বিচলিত শিথিল প্রযত্নশীল পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ শ্রীমানদের [‘শুচীনাম্’-শুদ্ধ (সত্য) আচরণযুক্ত যে সেই শ্রীমান্।] ঘরে জন্মগ্রহণ করে যোগীকুলে প্রবেশ পান, সাধনার দিকে আকর্ষিত হয়ে বহুজন্ম ধরে চলে সেই স্থানে পৌঁছে যান, যাকে পরমগতি, পরমধাম বলা হয়। শিথিল প্রযত্নশীল কে? যোগভ্রষ্ট হয়ে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? গৃহস্থই তো হন। সেখান থেকেই তিনি সাধনোন্মুখ হন। নবম অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে তিনি সাধুই; কারণ তিনি নিশ্চয় করে সঠিক পথে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতি দুরাচারী কে? যিনি ভজনে প্রবৃত্ত তিনি অথবা সেই ব্যক্তি যে প্রবৃত্তই হয়নি। নবম অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকে বলেছেন— স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিযুক্তই হোক না কেন, আমাকে আশ্রয় করে সাধন করলে

পরমগতিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেননি যে, তাকে হিন্দু, খৃষ্টান অথবা মুসলমান হতে হবে। তিনি বলেছেন, অতি দুরাচারী পাতকী হোক না কেন, আমার শরণাগত হলে পরমগতিলাভ করে। অতএব গীতাশাস্ত্র মানুষ মাত্রের জন্য। সদ্‌গৃহস্থ আশ্রম থেকেই এই কর্ম আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ সেই সদ্‌গৃহস্থই যোগী হন, পূর্ণত্যাগী হন ও তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন করে তাতেই প্রবেশ পান, যাঁর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–'জ্ঞানী আমারই স্বরূপ'।

নারী–গীতা অনুসারে মানবশরীর হ'ল বস্ত্রের সমান। ঠিক যেভাবে আমরা মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করি, সেইভাবেই সকল প্রাণীর শ্বামী জীবাত্মাও পুরনো শরীর (বস্ত্র) বর্জন করে নতুন দেহে (বস্ত্রে) প্রবেশ করে। আপনার কায়িক আকার পুরুষের হোক বা নারীর-তা শুধু জীবাত্মার পরিধেয় মাত্র।

জগতে পুরুষের শ্রেণী দুটি–ক্ষর ও অক্ষর। সকল প্রাণীর দেহ ক্ষর পুরুষ অথবা পরিবর্তনশীল পুরুষ। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যখন কুটস্থ হয়, তখন পুরুষ অক্ষর হন। সেই অক্ষর পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। এটা ভজনার অবস্থা-বিশেষ।

বিভিন্ন সময়ে সমাজে নারীজাতিকে সম্মান বা অসম্মানের চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু গীতার অপৌরুষেয় বাণীতে একথা উল্লিখিত–যেকোন জীবাত্মা তা সে শূদ্র (অল্পজ্ঞ) হোক, বৈশ্য (বিধিপ্রাপ্ত) হোক, স্ত্রী-পুরুষ যে কেউ আমার শরণাপন্ন হয়ে পরমগতি লাভ করে। তাই আধ্যাত্মিক পথে নারীজাতিরও পুরুষের পাশে সমান স্থান রয়েছে।

ভৌতিক সমৃদ্ধি–গীতাশাস্ত্র পরমকল্যাণকর, তার সঙ্গে মানুষের জন্য আবশ্যক ভৌতিক বস্তুগুলির বিধানও করে। নবম অধ্যায়ের ২০ থেকে ২২শ শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, বহুলোক নির্ধারিত বিধি দ্বারা আমাকে পূজা করে পরিবর্তে স্বর্গ কামনা করে, আমি তাদের বিশাল স্বর্গলোক প্রদান করি। যা চাইবে, আমি তা-ই দেব; কিন্তু উপভোগের পর ফুরিয়ে যাবে, কারণ স্বর্গের ভোগও নশ্বর। তাদের আবার জন্ম নিতে হবে। হ্যাঁ যেহেতু তারা আমার সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্য তারা নষ্ট হবে না; কারণ আমি কল্যাণস্বরূপ। আমি তাদের ভোগবস্তু প্রদান করি ও ধীরে ধীরে সে সমস্ত থেকে নিবৃত্ত করে আবার তাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করি।

ক্ষেত্র–যে পরমাত্মার শ্রীমুখের বাণী এই গীতা, তিনি স্বয়ং পরিচয় দিয়েছেন যে, "**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**"- অর্জুন! এই দেহটাই ক্ষেত্র (খেত) এতে ভাল-মন্দ কর্মের যে বীজ বপন করা হয়, তা সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয় ও কালান্তরে সুখ-দু:খরূপ ভোগের রূপে তা লাভ হয়। আসুরী সম্পদ্ অধম যোনিতে জন্মের কারণ, কিন্তু দৈবী সম্পদ্ পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে। সদ্গুরুর সান্নিধ্য থেকেই এদের মধ্যে নির্ণায়ক যুদ্ধের আরম্ভ হয়, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-এর যুদ্ধ এটাই।

টীকাকারগণ বলেন- এক কুরুক্ষেত্র বহির্জগতে স্থিত ও অন্যটি মনের অন্তরালে, গীতাশাস্ত্রের একটা অর্থ বাহ্য , অন্যটা আন্তরিক; কিন্তু এরূপ নয়। বক্তা বলেন এক কথা; কিন্তু শ্রোতাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিষয়বস্তু ভিন্নভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে। সেইজন্য বহু অর্থ প্রতীত হয়। সাধন-পথে ক্রমশঃ চলে যে পুরুষই শ্রীকৃষ্ণের স্তরে পৌঁছবেন, তাঁর সম্মুখেও সেই দৃশ্যই হবে যা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ছিল। সেই মহাপুরুষই তাঁর মনোগত ভাবগুলি, গীতা শাস্ত্রের সংকেতগুলি বুঝতে পারবেন ও বোঝাতে পারবেন।

গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য জগতের চিত্রণ করে না। খাওয়া, পরা ও থাকা সম্বন্ধে আপনি অবগত। জীবনযাত্রার রীতি, মান্যতা, লোকরীতি-নীতিতে দেশকাল ও পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্তন প্রকৃতির অধীন। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি ব্যবস্থা দেবেন? কোথাও মেয়েদের বাহুল্য, সেখানে বহুবিবাহ হয়, আবার কোথাও তাদের সংখ্যা কম। সেখানে কয়েকজন ভাই একটিমাত্র মেয়েকে বিবাহ করে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ কি ব্যবস্থা দেবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে জনসংখ্যার ন্যূনতা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন সেখানে তিরিশটি সন্তানের জননীকে 'মাদারল্যাণ্ড' (দেশমাতা) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। বৈদিককালীন ভারতে দশটি সন্তান উৎপন্ন করার বিধান ছিল, এখন "এক অথবা দো বচ্চে, হোতে হ্যায় ঘরমেঁ আচ্ছে", সরকারী প্রচার অভিযান চলেছে। যদি তারা বেঁচে না-ও থাকল, তাতে চিন্তার কিছু নেই, সমস্যার সমাধানই হয়। শ্রীকৃষ্ণ এতে কি ব্যবস্থা দেবেন?

শ্রেয়–কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি বিকারের সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য কোথাও বিদ্যালয় খোলা হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিকারসমূহের বিষয়ে বয়োবৃদ্ধদের থেকে ছোটরাই অনেক সময় বেশী প্রবীণ দেখা গেছে। এ বিষয়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি শিক্ষা দেবেন? এসব তো প্রকৃতিদ্বারা স্বচালিত। একসময় বেদ প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হত, ধনুর্বিদ্যা-গদাযুদ্ধ শেখানো হত, বর্তমানে এগুলি কে শিখতে চায়? আজকের যুগে পিস্তল চালাচ্ছে। স্বচালিত যন্ত্রের যুগ এটা। কখনও রথ-সঞ্চালন শেখার প্রয়োজন ছিল, ঘোড়ার বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে হত—আজকের যুগে মোটরের তেল পরিষ্কার করা হয়। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি বলবেন? পূর্বকালে স্বাহা বললে বর্ষা হত, আজকের যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণের সাহায্যে মনের মত ফসল উৎপাদন করা হয়। যোগেশ্বর বলছেন যে, প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের বশীভূত হয়ে মানুষ পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য স্থাপিত করে চলেছে। এই গুণগুলি স্বত-ই তাদের গড়ে নিতে সক্ষম। ভৌতিকশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি মানুষ রচনা করতেই থাকে। একটা বস্তুই এমন, যা মানুষ জানে না, চেনে না, আছে তার কাছেই; কিন্তু সে সম্বন্ধে সে বিস্মৃত। গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করে অর্জুনের স্মৃতিলাভ হয়েছিল। সেই স্মৃতি হল পরমাত্মার স্মৃতি, যা হৃদয়-দেশে থাকলেও বহুদূরে আছে। মানুষ তা-ই পেতে চায়; কিন্তু পথ খুঁজে পায়না। কেবল কল্যাণের পথ সম্বন্ধে মানুষ অনভিজ্ঞ। মোহ-এর আবরণ এত ঘন যে, সে বিষয়ে চিন্তা করার সময়ই জোটে না। সেই মহাপুরুষ আপনার জন্য সময় দিয়েছেন, সেই কর্ম স্পষ্ট করেছেন, যার অনুষ্ঠান করার নির্দেশ গীতাশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। গীতা মুখ্যতঃ এটাই প্রদান করে। ভৌতিক বস্তুও লাভ হয়; কিন্তু শ্রেয়-এর তুলনায় প্রেয় নগণ্য।

যোগপ্রদাতা—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, কল্যাণপথের পরিচয়, এর সাধন ও প্রাপ্তি সদ্‌গুরু দ্বারাই সম্ভব। তীর্থভ্রমণ, এদিক্-সেদিক্ ভ্রান্ত হয়ে ঘুরলে অথবা কায়-ক্লেশ দ্বারাও সেই কল্যাণপথের জ্ঞান ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ কোন সন্তদ্বারা নির্দেশিত না হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হয়ে উত্তমরূপে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে, নিষ্কপটভাবে সেবা করে, প্রশ্ন করে সেই জ্ঞান লাভ কর। প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হল, কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য এবং তাঁর সেবা। তাঁর অনুসারে চলে যোগের সংসিদ্ধিকালে সেই তত্ত্বলাভ হবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, জ্ঞান অর্থাৎ জানার বিধি ও জ্ঞেয় পরমাত্মা তিনটিই কর্মের প্রেরক। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে মহাপুরুষই কর্মের মাধ্যম, কেবল পুস্তক নয়। পুস্তকে বিধি মাত্র থাকে। ঔসুধের বিবরণ লিখিত কাগজে পড়লেই যেমন রোগ

আরোগ্য হয় না, বরং নিয়ম মেনে চলতে হয়।

নরক—ষোড়শ অধ্যায়ে ১৬শ শ্লোকে আসুরী সম্পদের বর্ণনা করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, বহু চিত্তবিভ্রান্ত, মোহজালে আবৃত আসুরী স্বভাবযুক্ত মানুষ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, নরক কিরূপ ও কাকে বলে? এই ক্রমেই স্পষ্ট করেন যে, যারা আমাকে দ্বেষ করে, সেই নরাধমদিগকে আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করি, অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। এটাই নরক। নরকের দ্বার কি? বলছেন—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ। এদের সাহায্যেই আসুরী সম্পদের গঠন হয়। অতএব বারংবার কীট-পতঙ্গ, পশু ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করাই নরক।

পিণ্ডদান—প্রথম অধ্যায়ে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন আশঙ্কিত হয়েছিলেন যে, যুদ্ধজনিত নরসংহারে পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডদান ও তর্পণ থেকে বঞ্চিত হবেন, নরকে পতিত হবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল? পিণ্ডোদক ক্রিয়াকে যোগেশ্বর অজ্ঞান বলেছেন ও আরও বলেছেন যে, যেরূপ জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্রত্যাগ করে মানুষ নতুন বস্ত্র ধারণ করে ঠিক সেইরূপ এই আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে তৎকাল দেহরূপ নতুন বস্ত্র ধারণ করে। এখানে দেহটা বস্ত্রমাত্র এবং যখন আত্মা কেবল বস্ত্র পরিবর্তন করলেন তখন তাঁর মৃত্যু হল কোথায়? নশ্বর দেহটাই শুধু পরিবর্তন করেছেন, তাঁর ব্যবস্থা পূর্ববৎ থাকল, তবে এই ভোজন (পিণ্ডদান), আসন, শয্যা, বাহন, আবাস অথবা জল ইত্যাদি দ্বারা কাকে তৃপ্ত করা হয়? এই কারণেই এগুলিকে যোগেশ্বর অজ্ঞান বলেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে এর উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই আত্মা আমার সনাতন অংশ, স্বরূপ এবং মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপজন্য সংস্কার আকর্ষণ করে অন্যদেহ ধারণ করে ও মনসহিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়দ্বারা নতুন দেহে বিষয়-ভোগসমূহ উপভোগ করে। আত্মা যখন অন্যদেহ ধারণ করে তখন সেখানেও ভোগ-সামগ্রী থাকেই, তাহলে পিণ্ডদান কেন করা হয়? এদিকে দেহত্যাগ, অন্যদিকে নতুন দেহ ধারণ, আত্মা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে প্রবেশ করে, মাঝে বিরামের কোন স্থান নেই, তাহলে হাজার হাজার পিতৃগণের অনাদিকাল ধরে পতিত থাকার কল্পনা ও তাদের জীবিকা বংশ-পরম্পরার হাতে নির্ধারিত করে এবং খাঁচার পাখীর মত তাদের ক্রন্দন, পতন অজ্ঞানেরই পরিচয় মাত্র। তা-ই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বলেছেন।

পাপ ও পুণ্য—এই বিষয়ে সমাজে বহুভ্রান্তি প্রচলিত; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে রজোগুণজাত এই কাম ও ক্রোধ, ভোগ-উপভোগ করে কখনও তৃপ্ত হয় না, দু:খদায়ক। অর্থাৎ কাম হল পাপের একমাত্র কারণ। পাপের উদ্‌গম কাম অর্থাৎ কামনাসমূহ। এই কামনাগুলি থাকে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিকে কামনার বাস-স্থান বলা হয়। যখন বিকার দেহে থাকে না মনে থাকে, তখন দেহটাকে ধুয়ে কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে নামজপদ্বারা, ধ্যানদ্বারা, সমকালীন কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবাদ্বারা, তাঁর প্রতি সমর্পণের ভাবদ্বারা মন শুদ্ধ হয়, তার জন্য তিনি ৪/৩৪-এ প্রোৎসাহিত করেছেন যে, '**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন**' সেবা ও প্রশ্ন করে সেই জ্ঞানলাভ কর, যার দ্বারা সকল পাপনাশ হয়।

অধ্যায় ৩/১৩-তে তিনি বলেছেন যে, সন্তগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন এবং যারা দেহের জন্য অন্নপাক করে, সেই পাপাচারীগণ পাপান্ন ভোজন করে। এখানে যজ্ঞ চিন্তনের একটি নিশ্চিত ক্রিয়া, যার দ্বারা মনের মধ্যে নিহিত চরাচর জগতের সংস্কার ভস্ম হয়ে যায়। শুধু ব্রহ্মই থাকেন। অতএব দেহের উৎপত্তির কারণ হল পাপ এবং যা সেই অমৃত তত্ত্ব প্রদান করে, যারপর আর দেহধারণ করতে হয় না, তা-ই পুণ্য।

অধ্যায় ৭/২৯-এ তিনি বলেছেন যে, যাঁরা জরামৃত্যু এবং দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমার শরণাগত হয়ে সাধনা করেন, যে পুণ্যকর্মা পুরুষগণের পাপনাশ হয়েছে, তাঁরা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম এবং উত্তমরূপে আমাকে জানেন ও জেনে আমাতেই স্থিত থাকেন। অতএব পুণ্যকর্ম তা-ই যা জরা-মৃত্যু ও দোষ থেকে মুক্ত করে শাশ্বতের অনুভূতি ও তাতেই সর্বদার জন্য স্থিতি প্রদান করে। যে কর্ম জন্ম-মৃত্যু, জরা-মরণ, দুঃখ-দোষের পরিধির মধ্যেই ঘোরাতে থাকে সেই কর্মকে পাপকর্ম বলে।

অধ্যায় ১০/৩-এ বললেন—যিনি আমাকে জন্ম-মৃত্যুরহিত, আদি-অন্তরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করে অবগত হন, মরণধর্মা মনুষ্য মধ্যে সেই পুরষই জ্ঞানবান্, এইরূপ জেনে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। অতএব সাক্ষাৎকারের পরেই সর্বপাপ থেকে নিবৃত্তি হয়।

সারাংশতঃ বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণই পাপ, ও তার থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত পরমাত্মার দিকে এগিয়ে দেয়, পরমশান্তি প্রাপ্ত করায়, তা-ই পুণ্যকর্ম। সত্য বলা, কেবল স্ব উপার্জিত অন্নগ্রহণ, স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব, সত্যতা ইত্যাদিও এই পুণ্যকর্মের সহায়ক অঙ্গ; কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্য হল পরমাত্মার প্রাপ্তি। যা একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাকে ভঙ্গ করে, তা-ই পাপ।

সকল সন্তই এক–গীতা, অধ্যায় ৪/১-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কল্পের আদিতে এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণপূর্বকালীন অথবা অন্য কোনও শাস্ত্রে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নেই।

বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগেশ্বর ছিলেন। তিনি অব্যক্ত ও অবিনাশীভাবের স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ। যখনই পরমাত্ম-প্রাপ্তির ক্রিয়া অর্থাৎ যোগের সূত্রপাত করা হয়েছে, তখন তা স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষই করেছেন, তা তিনি রাম হোন অথবা ঋষি জরথুস্ত্র। পরবর্তীকালে এই উপদেশই যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, গুরুনানক ইত্যাদি যার দ্বারাই বলা হয়েছে, তা শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন।

অতএব সকল মহাপুরুষই এক। সকলেই এক বিন্দুর স্পর্শ করে একটাই স্বরূপ লাভ করেন। এই পদ একটি একক। বহুপুরুষ এই পথে গমন করবেন কিন্তু যখন লাভ করবেন, তখন সকলেই এক পদলাভ করবেন। এরূপ অবস্থাযুক্ত সন্তের দেহ বাস-স্থান মাত্র, তিনি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। এরূপ স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ যখনই কিছু বলেছেন, তখন তা সেই এক যোগেশ্বরই বলেছেন।

সন্তপুরুষ কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ তো করেনই। পূর্ব অথবা পশ্চিমে, শ্যাম অথবা শ্বেত পরিবারে, পূর্ব প্রচলিত কোন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অথবা অবোধ যাযাবর পরিবারে, গরীব অথবা ধনীর গৃহে জন্ম নিয়েও সন্তপুরুষ পরিবারের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হয় না। তিনি নিজের লক্ষ্য পরমাত্মাকে অবলম্বন করে স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান ও শেষে তা-ই হন। তাঁদের উপদেশ জাতি-ভেদ, বর্গ-ভেদ ও ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এমনকি তাঁদের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের ভেদও থাকে না। (দেখুন গীতা-১৫/১৬-“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে।”)

মহাপুরুষগণের দেহত্যাগের পর তাঁদের অনুগামীগণ স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কোন মহাপুরুষের অনুগামীগণ ইহুদী হয়, কারও

খৃষ্টান, মুসলমান, সনাতনী ইত্যাদি হয়ে যায়; কিন্তু এই বিভেদের সঙ্গে সন্তের কোন সম্পর্ক থাকে না। সন্ত কোন সম্প্রদায় অথবা জাতি নন। সন্ত, সন্তই হন। তাঁদের কোন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।

অতএব সম্পূর্ণ সংসারের সন্তদের, তা যে কোন সম্প্রদায়েই তাঁর জন্ম হোক না কেন, কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর বেশীই পূজা করুন না কেন, কোন সাম্প্রদায়িক প্রভাবে এসে এরূপ সন্তদের আলোচনা করা উচিত নয়; কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ। সংসারে যে কোন স্থানে উৎপন্ন হোন, সন্ত নিন্দার যোগ্য নন। যদি কেউ এরূপ করে, তাহলে সে অন্তরে স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দুর্বল করে, স্বীয় পরমাত্মা থেকে দূরে সরে যায়, স্বয়ং নিজের ক্ষতি করে। সংসারে জাত কোন ব্যক্তি যদি সত্যই আপনার হিতৈষী, তাহলে সন্তই সেই ব্যক্তি-বিশেষ হবেন। অতএব তাঁদের প্রতি সহৃদয় হওয়া সম্পূর্ণ সংসারের লোকেদের মূলকর্তব্য। এর থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া।

বেদ—গীতাশাস্ত্রে বেদের উদাহরণ অনেকবার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই সকল পথ-প্রদর্শক চিহ্ন (Mile Stone) মাত্র। গন্তব্যে উপনীত ব্যক্তির জন্য এই পথ-প্রদর্শক চিহ্ন এর উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়। অধ্যায় ২/৪৫-এ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! বেদ ত্রিগুণ পর্যন্তই আলোকপাত করতে পারে, তুমি বেদের কার্যক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে ওঠ। অধ্যায় ২/৪৬-এ বলেছেন—পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুসের ছোট জলাশয়ের যতটা প্রয়োজন থাকে; তদ্রূপ উত্তম প্রকার ব্রহ্মজ্ঞাতা মহাপুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বেদের ততটাই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য এর উপযোগিতা থাকেই। অধ্যায় ৮/২৮-এ বলেছেন—অর্জুন! আমাকে তত্ত্বসহিত উত্তম প্রকারে অবগত হওয়ার পরে যোগী বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদির পুণ্যফল অতিক্রম করে সনাতন পদলাভ করেন। অর্থাৎ যতক্ষণ বেদ জীবিত, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ, ততক্ষণ সনাতন পদলাভ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় ১৫/১-এ বলেছেন—ঊর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত প্রকৃতি যার শাখা-প্রশাখা, এই সংসার সেইরূপ অশ্বত্থরূপ অবিনাশী বৃক্ষ। যিনি এই বৃক্ষকে মূলসহিত জানেন, তিনিই বেদের জ্ঞাতা। একে অবগত হওয়ার একমাত্র স্রোত মহাপুরুষ, তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট ভজন। পুস্তক অথবা পাঠশালাও তাঁর দিকেই প্রেরণ করে।

ওঁ—শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মত ওঁ জপ করার বিধান পাওয়া যায়। অধ্যায় ৭/৮-এ বলেছেন—ওঁকার আমি। ৮/১৩-এ বলেছেন—ওঁ জপ ও আমার চিন্তন কর। অধ্যায় ৯/১৭-এ বলেছেন—জানার যোগ্য পবিত্র ওঁকার আমি। অধ্যায় ১০/৩৩-এ বলেছেন—আমি অক্ষরসমূহতে অকার। ১০/২৫-এ বলেছেন—শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর। অধ্যায় ১৭/২৩-এ বলেছেন—ওঁ, তৎ ও সৎ ব্রহ্মের পরিচায়ক। ১৭/২৪-এ বলেছেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম ওঁ থেকে আরম্ভ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ওঁ জপ করা নিতান্ত আবশ্যক, এর বিধি স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে অবগত হোন।

গীতোক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি—গীতা আদিমানব মহারাজ মনুরও পূর্বে উদ্ভাসিত হয়েছিল-'**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।**' (৪/১) অর্জুন! আমি এই অবিনাশী যোগ-সম্বন্ধে কল্পারম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম এবং সূর্য মনুকে বলেছিলেন। মনু তা স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, কারণ শ্রবণ করার পর বিষয়-বস্তু স্মৃতিতেই সুরক্ষিত করে রাখা সম্ভব ছিল। এই জ্ঞান সম্বন্ধেই মনু রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ইক্ষ্বাকুর কাছ থেকে পরবর্তীকালে রাজর্ষিগণ জানতে পারেন এবং এই মহত্ত্বপূর্ণ কালে এই অবিনাশী যোগ এই পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আদিকালে বক্তার কাছে শ্রবণ করে তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার পরম্পরার ছিল। লিপিবদ্ধ করে রাখার কথা কল্পনার বাইরে ছিল। মনু মহারাজ এই জ্ঞান স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন এবং স্মৃতি-পরম্পরার প্রবর্তন করেছিলেন। অতএব এই গীতোক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ মনুস্মৃতি।

এই জ্ঞান-সম্বন্ধে ভগবান মনুরও পূর্বে সূর্যকে বলছিলেন, তবে কেন এই স্মৃতিকে 'সূর্যস্মৃতি' বলা হয় না? বস্তুতঃ সূর্য জ্যোতির্ময় পরমাত্মার সেই অংশ, যার থেকে মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিই পরমচেতন বীজরূপ পিতা এবং প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা।" বীজরূপ পিতা সূর্য। পরমাত্মার সেই প্রশক্তি সূর্য, যে শক্তি মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই শক্তি ব্যক্তি-বিশেষ নয়। পরমাত্মার জ্যোতির্ময় তেজ থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। সেই তেজের মাধ্যমেই গীতোক্ত জ্ঞানও প্রসারিত করেছেন অর্থাৎ সূর্যকে বলেছেন। সূর্যপুত্র মনুকে তা বলেছেন, সেইজন্য এটি 'মনুস্মৃতি'। এখানে সূর্যের তাৎপর্য ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বীজকে সূর্য বলা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অর্জুন! সেই পুরাতন যোগসম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, অনন্য সখা। অর্জুন মেধাবী এবং যোগ্য ছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তিনি একটার পর একটা প্রশ্ন করে গিয়েছিলেন। যেমন—আপনার জন্ম অনেক পরে হয়েছে এবং সূর্যের জন্ম বহুপূর্বে হয়েছিল। যোগসম্বন্ধে আপনিই সূর্যকে বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? এইরূপ কুড়ি-পঁচিশটি প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। গীতার সমাপনপর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গিয়েছিল। যে প্রশ্ন অর্জুন করতে পারেননি সে সকল প্রশ্নের সমাধান ভগবান স্বয়ং করেছেন। অতপর ভগবান বললেন—অর্জুন! তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহের বিনাশ হল কি? এই প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ৎবৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।১৮/৭৩।।

ষভগবন্! আমার মোহনাশ হয়েছে এবং স্মৃতিলাভ হয়েছে। কেবল শ্রবণ করিনি বরং স্মৃতিতে ধারণ করেছি। আমি আপনার আজ্ঞাপালন করব, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। তিনি ধনুর্ধারিণ করেছিলেন, যুদ্ধ হয়েছিল, বিজয়ী হয়ে, বিশুদ্ধ ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন এবং একমাত্র ধর্মশাস্ত্ররূপে আদি ধর্মশাস্ত্র গীতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গীতা আদি ধর্মশাস্ত্র। এটাই মনুস্মৃতি, যা অর্জুন নিজের স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। মনুর দুটি কৃতির উল্লেখ রয়েছে, প্রথমতঃ পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত গীতা, দ্বিতীয়তঃ বেদ মনুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল। তৃতীয় কোন কৃতি মনুর কালে ছিল না। সেইকালে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচলন ছিল না, কাগজ, কলমের প্রচলন ছিল না, সেইজন্য জ্ঞান শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণ করে স্মৃতিতে সুরক্ষিত করে রাখার পরম্পরা ছিল। সৃষ্টির প্রথম মানুষ মনু মহারাজ যাঁর থেকে অন্যান্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে তিনি বেদকে শ্রুতি এবং গীতা শাস্ত্রকে স্মৃতির সম্মান দিয়েছেন।

বেদ মনুর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছিল। বেদ শ্রবণযোগ্য, শ্রবণ করুন। যদি পরবর্তীকালে ভুলেও যান কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু গীতা স্মৃতিগ্রন্থ, সর্বদা স্মরণ রাখবেন। এই গ্রন্থ শাশ্বত জীবন, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন জীবন প্রদানকারী ঈশ্বরীয় গায়ন।

ভগবান বলেছেন—অর্জুন! যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার উপদেশ শ্রবণ না কর তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ গীতার উপদেশ যে অবহেলা করে, তার নাশ হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক (১৫/২০)-এ ভগবান বলেছেন, **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।'**— এইরূপ অতিগোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে তুমি পূর্ণজ্ঞান এবং পরমশ্রেয় লাভ করবে। ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের অন্তিম দুটি শ্লোকে বলেছেন—**'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।'** এই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করেন না অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি সিদ্ধিলাভের যোগ্য নন। সুখ, সমৃদ্ধি কিছু লাভ করতে পারেন না।

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।' অতএব অর্জুন! কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে যে-'কি করা উচিত-কি করা উচিত নয়, শাস্ত্রই এ বিষয়ে তোমার জ্ঞাপক। অতএব শাস্ত্রবিধির স্বরূপ জেনে তোমার নিয়ত কর্ম করা উচিত। তুমি তাহলে আমাকে লাভ করবে এবং শাশ্বত জীবন, শান্তি এবং সমৃদ্ধিলাভ করবে।

গীতাশাস্ত্রই মনুস্মৃতি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে গীতাই ধর্মশাস্ত্র। অন্য কোন গ্রন্থকে শাস্ত্র অথবা স্মৃতি বলা যেতে পারে না। সমাজে প্রচলিত বহু স্মৃতিগ্রন্থ গীতা বিস্মৃত হওয়ারই দুষ্পরিণাম। প্রচলিত অন্যান্য স্মৃতি কিছু রাজার সংরক্ষণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা সমাজে উঁচু-নীচু, জাতিভেদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এটা বজায় রাখার উপায়-বিশেষ। মনুর নামে প্রচারিত এবং কথিত মনুস্মৃতিতে মনুকালীন সমাজ-ব্যবস্থার চিত্রণ নেই। মূল মনুস্মৃতি গীতা একমাত্র পরমাত্মাকে সত্য বলে, তাঁতে বিলীন করিয়ে দেয়; কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত প্রায় ১৬৪ টি স্মৃতিতে পরমাত্মাকে লাভ করার উপায়ের উপর আলোকপাত করা হয়নি এমনকি পরমাত্মার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখায়। 'ন অস্তি'-যেগুলির অস্তিত্ব নেই সে সমস্ত লাভেরই জন্য প্রোৎসাহিত করে। স্মৃতিগুলিতে মোক্ষ-এর উল্লেখপর্যন্ত নেই।

মহাপুরুষ—মহাপুরুষ বাহ্য ও আন্তরিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক, লোক-রীতি ও যথার্থ বেদ-রীতি দুটিই জানেন। এই কারণেই সমস্ত সমাজকে মহাপুরুষগণ আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির বিধান দিয়েছেন এবং একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়েছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর স্বামী, মহাত্মা বুদ্ধ, মূসা, যীশু, মহম্মদ, রামদাস, দয়ানন্দ, গুরু গোবিন্দ সিংহ ও এইরূপ সহস্র

মহাপুরুষ-এইরূপ করেছেন; কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সাময়িক। পীড়িত সমাজকে ভৌতিক বস্তু প্রদান করলে, তারা স্থায়ীরূপে লাভান্বিত হতে পারে না। এই ভৌতিক উপলব্ধি ক্ষণস্থায়ী, শাশ্বত নয়। সেইজন্য সে সকলের সমাধানও তৎসাময়িক হয়। তা চিরন্তন ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

ব্যবস্থাকার – সমাজে প্রচলিত কুরীতিগুলি মহাপুরুষগণ দূর করেন। এগুলির সমাধান না করলে জ্ঞান-বৈরাগ্যজাত পরম-এর সাধনা সম্বন্ধে কে শুনবে? মানুষ যে পরিবেশে রয়েছে, সেখান থেকে তার মনকে সরিয়ে যথার্থ কি, তা অবগত হওয়ার অবস্থাতে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন উপায়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। এই অভিপ্রায়ে মহাপুরুষগণ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন, কোন বিধান দেন, তা ধর্ম নয়। এই বিধান একশ, দু'শ বছর পর্যন্ত চলে, চার ছ'শ বছরের জন্য উদাহরণ হয়ে যায় এবং হাজার দু' হাজার বছরের মধ্যে নতুন পরিস্থিতিতে সেই সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গুরু গোবিন্দ সিং-প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে শস্ত্র ধারণ অনিবার্য, কিন্তু এখন শস্ত্রের স্থানে তরবারি বেমানান। যীশু গাধার পিঠে বসতেন (মত্তী ২১) গাধার সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, বর্তমানে এর উপযোগিতা কি? তিনি বলেছিলেন কারও গাধা চুরি কোরো না। বর্তমানে ক'জন গাধা পোসে। এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎকালীন সমাজকে সর্বপ্রকারে ব্যবস্থিত করেছিলেন, এর উল্লেখ মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে করা হয়েছে, এই সঙ্গে গ্রন্থগুলিতে তিনি যথার্থের ও যত্র-তত্র চিত্রণ করেছেন। পরমকল্যাণকর সাধনা ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ গুলিয়ে ফেললে লোকে তত্ত্ব নির্ণায়ক ক্রম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থাগুলিকে সমাজ প্রয়োজনের অতিরিক্তই মেনে চলে; কারণ তা জাগতিক। "মহাপুরুষ বলেছেন"–এইরূপ বলে এই ব্যবস্থাগুলি যাতে ত্যাগ করতে না হয়, তারজন্য মহাপুরুষগণের দোহাই দেয়। মহাপুরুষ প্রদত্ত বাস্তবিক ক্রিয়া নিজেদের সুবিধে মত পরিবর্তন করে, সেই ক্রিয়া ভ্রান্তিযুক্ত করে দেয়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, কোরান প্রত্যেকটিতে শুধু ভ্রান্ত, যুক্তিহীন, ধারণা রয়ে গেছে। বহির্মুখী সমাজ এই গ্রন্থগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত ধাম, অনন্তজীবন, শাশ্বত শান্তি প্রদায়িনী গীতাশাস্ত্রকে জাগতিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করেছেন। ভারতের বৃহৎ ইতিহাস এবং মহত্ত্বপূর্ণ সংস্কৃতি শাস্ত্র হল মহাভারত। তিনি এই বৃহৎ ইতিহাসের মাঝেই গীতাশাস্ত্রের গায়ন করেছেন। যাতে

উত্তরপুরুষেরা এই ধর্মশাস্ত্রকে ধার্মিক ধরাতলে যথাবৎ বুঝতে পারে। কালান্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি এবং আরও বহু মহাপুরুষ পরমশ্রেয় লাভের যথার্থ বিধিকে সামাজিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে প্রস্তুত করেছেন।

গীতা মানুষ মাত্রের জন্য- ভগবান এই ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ **'প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে' (গীতা, ১/২০)** শস্ত্র-সঞ্চালনের সময়ই করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন জীব-জগতে কখনও শান্তি এবং সুখ লাভ হয় না। কেউ যদি অর্বুদ লোকের হত্যা করে জয়লাভ করেও তবুও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না এবং শেষে দু:খপ্রদই হবে, সেইজন্য তিনি গীতা শাস্ত্রের মাধ্যমে এইরূপ শাশ্বত যুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন; এতে একবার জয়লাভ করলে শাশ্বত বিজয়, অনন্ত জীবন এবং অক্ষয়ধাম লাভ হয়, যা মানুষমাত্রের জন্য সর্বদা সুলভ; যা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এর যুদ্ধ, প্রকৃতি এবং পুরুষের সংঘর্ষ, অন্তরে অশুভ এর নাশ এবং শুভ পরমাত্মস্বরূপের প্রাপ্তির সাধন।

উত্তম অধিকারীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণ একে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন যে, তোমার মত অতিশয় প্রিয় ভক্তের হিত কামনায় বলব। এ বিষয় অতি গোপনীয়। শেষে তিনি বললেন, যে ভক্ত নয়, তাকে ভক্তে রূপান্তরিত করে তবে তাকে বোলো। মানুষ মাত্রের জন্য যথার্থ কল্যাণের একমাত্র উপায়, যার ক্রমবদ্ধ বর্ণনা হল শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতাশাস্ত্র।

প্রস্তুত টীকা—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রসারিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্থ যথাবৎ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত টীকার নাম 'যথার্থ গীতা'। এই ভগবানের অন্ত:প্রেরণা উপর আধারিত। গীতা স্বয়ং পূর্ণ সাধনগ্রন্থ। সম্পূর্ণ গীতাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। বোধগম্য না হওয়ার জন্য সন্দেহ জাগতে পারে। অতএব কোথাউ বোধগম্য না হলে কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে বোঝার প্রয়াস করুন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!